

المفتون ۱۳

৫৫৫

قَسَمَ اللّٰهُ ۲۸

وَلَا يَمُنُّونَ إِلَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ الرَّحِيمَ ۙ
 قُلْ لَنْ الْمَوْتِ الَّذِي تَعْبُرُونَ مِنْهُ فَأَنْتُمْ مُلْفِتُونَ ثُمَّ تَرْدُونَ
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَنْزَلْنَا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَإِذَا
 قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
 لَمْ نَقْضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ
 وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۙ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُمْ آتَاكَ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِنَّكَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝
 إِنَّمَا أَمْهَلْتَهُمْ حَتَّىٰ تَضُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
 ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَمِعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَنُهَمُّهُمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

(৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জ্বালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জান্না আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (৯) মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বর কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন : আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

সূরা মুনাফিকুন

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনল্লাহকে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে চালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেহরে দেয়া হয়েছে। এতএব তারা বুঝে না।

উচিত ছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্জকজমক ও ধীনশূর্ষ তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সম্বন্ধে তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ, অযাচিতভাবে আল্লাহর এই নেয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একত্রে বহন করেনি ; অর্থাৎ, তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরওয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন স্বর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্শ্ববর্জক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জ্বাকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেন : যে আলেম তার এলম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের অনুরূপ।

ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে দাবী করত যে, عَنْ أَبِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاجِبٌ وَأَوْكَاةٌ অর্থাৎ, আমরা তো আল্লাহর সন্তান সন্ততি ও শ্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না ; বরং তাদের বক্তব্য ছিল :

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অর্থাৎ, ইহুদী না হয়ে কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। কলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ ইহকালের নেয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নেয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্রই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদের পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : আপনি ইহুদীদের বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহর বন্ধু ও শ্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্বিত থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর কোরআন নিজেই বলে : وَلَا يَمُنُّونَ إِلَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ অর্থাৎ, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্যে কুফর, শিরক ও কুফর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর শ্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা

সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(বুখারী-মা'আনী)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَشْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُتَيْنٌ
অর্থাৎ, ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন : যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণতঃ কারও সাধ্যে নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّوْا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমআ' বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা নজোমগুল, ভূমগুল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমআর দিন। এই দিনেই আদম (আঃ) সৃষ্টি হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সঞ্চারিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

আল্লাহ্ তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ব' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রীষ্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে।—(ইবনে-কাসীর) মুখতামুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরুবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমআ' রাখেন। এই দিনে কোরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুয়াই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তাআলা মুখতামুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সন্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'ব গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুয়াই - এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সঞ্চারিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই -এর আমলে

শুক্রবার দিনকে শুরু দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর দিন রেখেছিলেন।—(মাযহারী)

نَوَافِلُ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - نَوَافِلُ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

বোঝানো হয়েছে। سعى শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ শুরু সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্যে দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : শান্তি ও গাভীর সহকারে নামাযের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহ্র যিকেরের দিকে ত্বরান্বিত হওয়া। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে-কাসীর) বলে জুমআর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ - অর্থাৎ, বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জুমআর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রোতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলাবাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

পূর্বের আয়াতসমূহে জুমআর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্শ্বিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, জুমআর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِقِينَ - এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে,

যারা জুমআর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন : এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমআর নামাযের পর জুমআর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবদি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ঘটনার পরিস্থিতিতে বললেন : যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহইয়া ইবনে খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না ; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবু মালেক (রহঃ) বলেন : এই কাফেলার আগমনের

সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুশ্চাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।— (মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়তঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেৱীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লেখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা দেয়া ও হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমআর নামাযের পূর্বে খোতবা দেয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুনুত।—(ইবনে-কাসীর)

আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যে সওয়াল আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবাস্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে বাবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে।

সূরা আল-মুনাফিকুন

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা : এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে-ইসহাক (রহঃ)-এর রেওয়াজে অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর রেওয়াজে অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মাযহারী) ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসুলে করীম (রাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের মোকাবেলা করার জন্যে বের হন। এই জেহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফের হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছিলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সস্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহুলোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জেহাদের সমাপ্তি ঘটল।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম

করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন : **ما بال دعوى الجاهلية** অর্থাৎ, একি মুর্থতায়ুগের আহবান! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন : **دعوا فانها منتنة** এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন : প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা—সে যালেম হোক অথবা ময়লুম। ময়লুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম ও কে ময়লুম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেপে ধরা—সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মুর্থতাসূলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উপদেশবাণী শোনা মাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহাজাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপন-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্প্রদায়ের বাহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে।

সম্প্রদায় বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহায্যে কেরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজেলোক লালিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্প্রদায়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আকরামের ক্রোধ দেখে তার সশিখ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে

ওষর পেশ করে বলল : আমি তো একখাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অস্বাভাবিক সাহাবী ছিলেন রসূল (সাঃ) তাকে বললেন : বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন : না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবার বললেন : তোমার কোনরূপ বিবাস্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাক্কিন সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রাঃ) বললেন : আল্লাহর কসম, সমগ্র খায়রাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এসে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাক্কিনের গর্দন উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়াজে আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন : আপনি ওক্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বাধ্য করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর পুত্র জ্ঞানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলেন : যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরম্ভ করলেন : সমগ্র খায়রাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামতের সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহত্যাকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে হযরত আত্মসম্মুদন করতে পারবনা। এটা আমার জন্য আঘাতের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়' উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেলাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল : আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ

ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত : যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওষর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রথর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে একজায়গায় খামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লাস্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেলাম মনষিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন : সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাতক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ধৃত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামত (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশ জ্বলে বললেন : তুমি এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরায় স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমার্থা করা করবেন। এতে তোমরা মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন : আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাক্কিন লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রি বোঝার বারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রাঃ) বললেন : আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন :

ياغلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين في ابن ابي من اولها الى اخرها .

অর্থাৎ, হে বালক, আল্লাহ তাআলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাক্কিন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়াজে থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাক্কিন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায পৌঁছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল

এইভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন : 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বনিল-মুত্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুণ্যময়ী বিবিদের কাডারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিকলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা জনাছানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ' বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি মোজ্জেবা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

وَأَقْبَلَ لَهُمْ مَخَالِكُ بْنُ خَبَابٍ

মুনাফিক সরদার

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকুন নাখিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল : তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাখিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হাম্বির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল : তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্ধ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সেজদা করব? এই ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মাযহারী)

هُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدًا عَلَىٰ مِنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَبْتَصِرُوا

আহজাহ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং গুরাই তাদের অনু যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এস্থলে لَيْفَقَهُونَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকূফ ও নির্বোধ।

يَوْمَئِذٍ لَيُنَافِقُ كَيْفَ يَكُونُ إِلَىٰ الْيَوْمِ لِيُخَوِّجَنَّ الْأَعْرُسُ مِنْهَا الْأَرْثَ

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহায্যে-কোরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার

আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযতওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মুর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। এখানে কোরআন لَيْفَقَهُونَ এবং এর আসে لَيْفَقَهُونَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্শ্বক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নির্যেট জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিবাস্তি হলে সেটা বোধবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَيْفَقَهُونَ বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

এই সূরার প্রথম বক্ররতে

মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহক্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশে বাহ্যভঙ্গ নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় বক্ররতে ঋণটি মুমিনদেরকে সম্মোদন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহক্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু'টি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি। তাই এই দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতির মহক্বতে সর্বাবস্থায় নিদনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকার এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়—ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোন কোন তক্ষসীরবিদের মতে পাঞ্জীগানা নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।—(কুরতুবী)

وَأَنْفُسًا مِّنْ تَارْفَتَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

এই আয়াতে

মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকার অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ যাবতীয় এবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, গুণর, হজ্জ ইত্যাদি আর্থিক এবাদত স্বভাবভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। (দুই) মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কম্পনাও করতে পারে না যে, কাশা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাশা হজ্জ